অজন্তা ও ভগিনী নিবেদিতা

চঞ্চলকুমার ঘোষ

ভারতে তখন ইংরেজ রাজত্ব। সালটা সম্ভবত ১৮১৯। একদল ইংরেজ সৈনিক মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার অদূরে তাদের সেনানিবাস তৈরি করেছিল। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজনের নজর পড়ল পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু গুহা, স্তম্ভ, খিলান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বাগোড়া নদী। স্বাভাবিক কৌতূহলে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে সেই গুহায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে তারা বিস্ময়ভরা চোখে দেখল গুহার মধ্যে অপূর্ব সব চিত্র। সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন ছবি আঁকতে জানত। তারা কিছু ছবি নকল করল। কিছুদিন পর তাদের ফিরে যেতে হল।

সৈন্যদের আঁকা ছবি দেখে কিছু উৎসাহী মানুষ খুঁজে বার করল সেই গুহা। তারা গুহার ছবি দেখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদেশে মাদ্রাজ থেকে এলেন ক্যাপ্টেন রবার্ট গিল, কয়েক বছর থেকে তিনিই প্রথম অজন্তার ছবিগুলির অনুলিপি করলেন। এগুলি বিলেতে পাঠানো হল। সকলে মুগ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালে তাঁর বেশিরভাগ ছবি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তার পরেও অনেকে এসেছেন, কাজ করেছেন।

ধীরে ধীরে বিশ্বের মানুষ জানতে পারল অজন্তা গুহার কথা। ভারতীয় শিল্পের এক পরম বিস্ময় এই অজন্তা গুহামন্দির। বিশ্বের কাছে তাজমহলের পরই ভারতের সবচেয়ে সমাদৃত এই অজন্তা। প্রায় দু-হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল এর নির্মাণ। তারপর কয়েকশো বছর ধরে অসংখ্য শিল্পী, শ্রমিক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিল্পভাবনা আর শ্রমে গড়ে উঠেছে এই গুহামন্দির। এর নির্মাণকৌশল আর অসাধারণ শিল্পসুষমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। হিন্দু রাজত্বে এবং তার পরবর্তী কালে মুসলিম হানাদারদের হাতে অজন্তার গুহাচিত্রগুলির মধ্যে বেশকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘন অরণ্যের মধ্যে সকলের অগোচরে হারিয়ে যায় অজন্তা। কেটে যায় প্রায় হাজার বছর। তারপর সভ্যজগৎ ইংরেজ সৈন্যদের আনুকূল্যে এই গুহার সন্ধান পায়। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এই গুহাগুলি তৈরি হয়েছিল। পাহাড় কেটে তৈরি এই গুহার আকার অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো। এর গঠনশৈলী এমন যে সমস্ত দিন সূর্যের আলো প্রতি গুহার মুখে এসে পড়ে। অজন্তায় গুহার সংখ্যা ঊনত্রিশ। এর মধ্যে পাঁচটি চৈত্য অর্থাৎ

বিখ্যাত লেখক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা

উপাসনাগৃহ। বাকি চব্বিশটি বৌদ্ধবিহার বা সন্ন্যাসীদের আবাস। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের কাছে যে-জাতককথা বর্ণনা করেছেন শিল্পীরা তাকেই রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন পাথরের দেওয়ালে। এখন প্রশ্ন, কেন শিল্পীরা শহর-নগর ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে গেলেন ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তে।

আসলে অজন্তা নিজে থেকে হয়নি, মানুষে গড়েছে। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে যে-বাণিজ্যপথ ছিল অজন্তা ছিল তারই কাছে। তার নাম ছিল 'দাক্ষিণাত্যের দরজা'। বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় তিনশো বছর পরে সন্ন্যাসীরা এই স্থান পছন্দ করেন। তাঁদের অনলস পরিশ্রমে একটু একটু করে গড়ে ওঠে এইসব গুহামন্দির। সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে চারশো বছর। চালুক্যরাজারা সকল ধর্মকে সমান সম্মান দিতেন। তাঁদের সময়েই এই গুহামন্দির নির্মাণ উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রকূটরা এত উদার ছিলেন না। তবু বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি কমলেও এই নির্মাণের কাজ তাঁরা বন্ধ করেননি। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কাজ চলেছিল।

পাহাড়ে গুহায় এই কাজ করার পিছনে আর একটি কারণ ছিল। সেকালের শিল্পীরা জানতেন ইট-কাঠের মন্দিরে নানান সমস্যা, সারা বছর মেরামত করতে হয়। কিন্তু এই কঠিন পাহাড় কেটে একবার একটা মন্দির গড়লে আর কোনও ভাবনা নেই, চিরদিনের মতো নিশ্চিন্ত।

অজন্তার শিল্প যখন ধীরে ধীরে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠছিল সেই সময় ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ড থেকে আসেন লেডি হেরিংহ্যাম। তিনি ছিলেন নামকরা শিল্পী। টেম্পারা পদ্ধতিতে অঙ্কন প্রচলনের বিশিষ্ট পথিকৃৎ। ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। পরবর্তী দুবছরে তিনি দুবার ভারতে আসেন অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপি আঁকতে। সেই চিত্রের সংকলন প্রকাশিত হয় তাঁর 'অজন্তা ফ্রেসকোস' নামক বইতে।

লেডি হেরিংহ্যাম ছিলেন নিবেদিতার পরিচিত। ইংল্যান্ডে নিবেদিতা শিল্প-সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা করতেন। ভারতে এসে স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল। তিনি ১৮৯৬ সালে সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। বিদেশি ভাবনা ছেড়ে একান্ত ভারতীয় শিল্পভাবনা গড়ে তোলার পিছনে এই মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি। আর একাজে তাঁকে সবচেয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন নিবেদিতা। তার প্রমাণ পাই আচার্য নন্দলাল বসুর নানান রচনায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হ্যাভেলের কোনও বইতে নিবেদিতার নাম নেই। সম্ভবত নিবেদিতা নিজেই নিষেধ করেছিলেন, কারণ নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কুনজরে পড়েছিলেন। হ্যাভেলের বইতে তাঁর নাম থাকা হ্যাভেল ও আর্ট স্কুলের পক্ষে স্বস্তির হত না।

একটি চিঠিতে নন্দলাল লিখেছেন, ''সিস্টারের সঙ্গে হ্যাভেল, অবনবাবু, ওকাকুরা ও জগদীশ বসু প্রভৃতির শিল্পবিষয়ে আলোচনা হতো এবং সকলেই সিস্টারের আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা তাঁহাদের বই পড়িলেই বুঝা যায়।''

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে নিবেদিতার ভাবনা কত গভীর ও বাস্তবসম্মত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নন্দলালের ২৫ আগস্ট ১৯৫৪ তারিখের চিঠিতে। নিবেদিতা তাঁর তিনটি ছবি দেখে মন্তব্য করেন। ''একটি ছবি হলো—কৃষ্ণ সত্যভামার পায়ে ধরে মানভঞ্জন করছেন। এই ছবি দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে [সিস্টার] বললেন, এরূপ ছবি এঁকো না। পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের পায়ে ধরে মানভঞ্জন করা বড়ো লজ্জার ব্যাপার।

''দ্বিতীয়টি হলো—মা কালীর ছবি।... বললেন, এ-মূর্তি ঠিক আঁকা হয়নি। এত কাপড় জড়িয়েছ কেন? কালী যে দিগ্‌বসনা, নির্ভীক, প্রলয়ঙ্করী।

তিনি স্বামীজীর লেখা একটি কবিতা কালী বিষয়ে (Kali the Mother) পড়তে বললেন।"

তৃতীয়টি স্বামীজীর ছবি। গায়ে কাপড় জড়ানো দেখে ভগিনী বললেন, "এ হয়নি। এত কাপড় জড়িয়েছ কেন স্বামীজীর গায়ে? তিনি এত কাপড় জড়াতেন না। তোমাদের দেশের ক্লাইমেটে বেশি কাপড় জড়ানো যায় না। বুদ্ধের দ্যাখো, ওঁর গায়ে কি কাপড় জড়ানো আছে? স্বামীজী ছিলেন বুদ্ধের মতো।"

লেডি হেরিংহ্যাম যখন ভারতে এলেন তাঁকে সাহায্য করার দায়িত্ব পড়ল নিবেদিতা ও হ্যাভেলের ওপর। নিবেদিতা চেয়েছিলেন বাংলার তরুণ শিল্পীরা এই কাজে লেডি হেরিংহ্যামকে সাহায্য করুক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিল্পীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলা। তিনি বারবার সাবধান করতেন, শিল্পীরা যেন শিল্প ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ না দেয়। তখন দেশভাগ হওয়ার পর চলেছিল প্রবল স্বদেশি আন্দোলন—তরুণদল ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বোমা-পিস্তল নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে—যারা ধরা পড়ছে ফাঁসি যাচ্ছে। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন শুধু সশস্ত্র আন্দোলন নয়, দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য শিল্প-সংস্কৃতির নব জাগরণও সমান প্রয়োজন। আর শিল্পীদের হাতে দেশের এই হারিয়ে-যাওয়া শিল্পের নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটিও দেশের জাগৃতির ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা সকলকে বোঝাতেন।

লেডি হেরিংহ্যামকে চিঠি লিখে দিলেন নিবেদিতা। উত্তরে তিনি জানালেন, বম্বে থেকে আর্টিস্ট পেয়েছেন তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য, আর কাউকে প্রয়োজন নেই। নিবেদিতা দমবার পাত্রী নন। তিনি বুঝেছিলেন এতে নন্দলালদের উপকার হবে, তাই যেভাবে হোক তাঁদের পাঠাতে চাইছিলেন। আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন ভগিনী। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, "[সিস্টার আমায়] বললেন, 'খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এ-রকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' নিবেদিতা যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে নিয়ে সমস্ত খরচপত্তর দিয়ে নন্দলালদের ক'জনকে পাঠিয়ে দিলুম অজন্তায়। পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা। কী জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে, জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়। মনে আর শান্তি পাইনে। গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে। বললুম, 'সেখানে ওদের খাওয়া দাওয়াই-বা কী হচ্ছে, রান্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলেমানুষ সব।' নিবেদিতা বললেন, 'আচ্ছা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।' বলে গণেন-মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন। ডাল চাল তেল নুন ময়দা ঘি আর একজন রাঁধুনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা করে, গণেনকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলালদের কাছে। তবে নিশ্চিন্ত হই।"

নিবেদিতা চেয়েছিলেন শিল্পীরা হাতে কলমে কাজ শিখুক। বইয়ে দেখা ছবি দিয়ে নয়, সরাসরি সামনে গিয়ে তারা উপলব্ধি করুক সেই মহান শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব—যাতে উত্তরকালে তারাই এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারে। তাই অজন্তায় লেডি হেরিংহ্যামের কাছে পাঠিয়ে তিনি নন্দলাল ও অসিতকুমার হালদারকে এই কাজে সংযুক্ত করতে চাইলেন। এ যে কত বড় কাজ তা হয়তো তখন উপলব্ধি করা যায়নি। এমনকী নন্দলালের মতো শিল্পীও অজন্তায় যাওয়ার ব্যাপারে তখন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এ-বিষয়ে বহুদিন বাদে ১৯৪৪ সালে শিষ্য কানাই সামন্তকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "হ্যারিঙ্গহম বৃদ্ধা English মহিলা artist, ও বড় Orient art copy-ist, অজন্তা copy করতে আসেন খুব সম্ভব

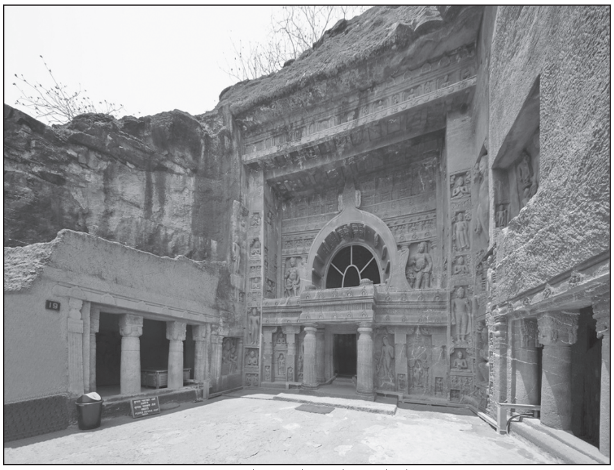

অজন্তা গুহার প্রবেশদ্বার

গণেন-মহারাজ সকলে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সিস্টার টাঙ্গা থেকে নামবার সময় 'দুর্গা দুর্গা' বলে নামছেন। তাঁর পরনে সাদা সিল্কের আলখাল্লা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, মুখ দীপ্ত ও আনন্দে উদ্ভাসিত।"

নিবেদিতার এই অপরূপ রূপের অসাধারণ বর্ণনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়ো।

England-এর Oriental Art Society হতে। তাঁহার কয়েকজন সহকারী copyist দরকার হয়। উহা তিনি সিস্টার নিবেদিতার through দিয়ে অবনবাবুকে জ্ঞাত করেন। অবনবাবু উহা আমায় ও অসিতকে জানান। কিন্তু তখন আমরা বড় কুনো ছিলাম, তাই ইতস্তত করছিলাম। এই শুনে নিবেদিতা আমায় ডেকে পাঠান এবং উহা যে আমাদের Indian artist-দের পক্ষে বিশেষ দরকার ও ভবিষ্যতে আমাদের শিল্পী হিসেবে উন্নত হবার কাজে লাগবে বুঝাইয়া দেন, এবং ঐ সুযোগ ছাড়তে নিষেধ করেন, এবং শেষে জোর করেই টিকিট ইত্যাদি ও ব্যবস্থা করে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ করে, অবনবাবুর কথা এড়ানো চলে, তাঁর [নিবেদিতার] কথা ঠেলা বড় কঠিন ছিল, ভীষণ তেজী মেয়ে [ছিলেন]।"

বিশ দশকের গোড়ায় ভারতীয় শিল্পের হাল অনেকটাই সামলেছেন নন্দলালের ভাষায় এই 'তেজী মেয়ে'। আরও পরে, জীবনের প্রান্তে পৌঁছে অজন্তার মধুর স্মৃতির কথা স্মরণ করে আচার্য নন্দলাল তাঁর ছাত্র বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে লিখেছেন, ''আমরা অজন্তায় পৌঁছবার পর, সিস্টার, ডক্টর বোস, লেডি বোস ও

বাগবাজারের ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে।... কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর- একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই। আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপর ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণচিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া সাহেব মেম গিস গিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার,... তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে।... সন্ধ্যে

হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেন চন্দ্রোদয় হল।... 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে তোমরা বল জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সে একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরী মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।... সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।... নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি দেখিনে আর, উপমা দেব কি।"

যাই হোক, ফিরে আসি নন্দলালের চিঠিটির প্রসঙ্গে। নিবেদিতা জানতেন ইংরেজ সরকারের বদ্ধমূল ধারণা বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের সকলেই স্বদেশি—সকলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোমা-পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করে। নিবেদিতার ভাবনা যে মিথ্যা ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্থানীয় রাজকর্মচারীদের আচরণে। অবশ্য লেডি হেরিংহ্যাম বিদেশিনি হলেও মায়ের মতো সকলকে আগলে রাখতেন। তবুও নিবেদিতার দুর্ভাবনা হত—ওই অরণ্যময় জনহীন প্রান্তরে ছেলেরা কেমন আছে কে জানে! তাই তিনি নিজেই চলে গেলেন অজন্তায়। তখন অজন্তা নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। জলগাঁও স্টেশন থেকে খানিক গোযানে, খানিক টাঙ্গায় করে গিয়েছিলেন।

অজন্তায় গিয়ে নিবেদিতার সামনে ভারতীয় শিল্পের এক নতুন দ্বার খুলে গিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের সুমহান শিল্পকলা আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে এই গুহামন্দিরে।

৬ জানুয়ারি ১৯১০ নিবেদিতা মিসেস উইলসনকে লিখেছিলেন, "ক্রিসমাসের প্রাক্কালে সারারাত ধরে, আমরা অজন্তার বিস্তীর্ণ রাস্তায় আনন্দ উচ্ছ্বাস করতে করতে চলেছিলাম। ঠিক যখন ভোর হল, তার এক ঘণ্টা আগেই শেষ রাতের অপূর্ব চাঁদ অস্তমিত হয়েছে। আমরা এসে পৌঁছলাম অজন্তায়। মিসেস হেরিংহ্যামের ক্যাম্পের তুষারসাদা তাঁবুতে, এসে তাকে মেরি ক্রিসমাস জানালাম। তারপরে আমরা তিনটি আনন্দদায়ক দিন কাটিয়েছি, শিল্প এবং ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি। বই পড়েছি। গুহার পথ ধরে হেঁটেছি।"

৩ মার্চ ১৯১০ তিনি মি. হ্যাভেলকে লেখেন, "আমার মনে হয় অজন্তায় তোলা... কিছু ছবি আপনার কাজে আসবে।... এটি ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং স্বপ্নের মতো। এগুলি হিন্দু সংস্কৃতির ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক অসাধারণ রূপ। দুর্দান্ত! বিশেষত অঙ্গসৌন্দর্যের কাজ, তার পেলবতা এর আগে কেউ দেখেনি। ইলোরা বা এলিফ্যান্টায় ভাস্কর্যের যে-রূপ দেখা যায় তা অজন্তায় নেই। তবে এখানকার চিত্রকলা বিশেষ করে তরুণ বুদ্ধ ও যশোধরা যে-গুহায় রয়েছে তা অতীব চমৎকার।"

৩১ মার্চ তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক এবং বন্ধু মি. র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন, "অজন্তাকে মনে হয়েছে ঝরনার ধারে খাদের মধ্যে একটি পাহাড়ি স্রোতের উপর ঝুলে থাকা বিখ্যাত প্রাচীন অ্যাবে ইউনিভার্সিটি। ধূসর-নীল পাথরে খিলান এবং কলোনেডের সারি।... ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির এই চমৎকার নিদর্শন, বিশেষ করে অঙ্গসৌন্দর্যের কাজ এবং তার পেলবতা এর আগে কেউ দেখেনি। নিঃসন্দেহে হিউয়েন সাং-এর দৌলতে পাওয়া এগুলিই প্রথম নিদর্শন। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় এ সবই বৌদ্ধভাবের নিদর্শন। এই চিত্রগুলি ইলোরার মতো নয়। বরং চিত্রকলার ইতিহাসের বিবর্তনের এক

ধারাবাহিকতাকেই বিধৃত করে। যা আমার খুব ভাল লাগছে। মিসেস হেরিংহ্যাম এই বিষয়ে অসাধারণ বোদ্ধা, এজন্য আপনাকে তাঁর কাছে রেখে যাচ্ছি। তবে আমি বলতে চাই যে তাঁর আগ্রহের সময়কালের আগেও সেখানে ফ্রাঁ আঞ্জেলিকো ঘরানার স্কুলের নিদর্শন রয়েছে অপেক্ষাকৃত পুরনো ভবনগুলিতে যা সবচেয়ে সুন্দর এবং অন্তস্পর্শী। গোটা বিষয়টি যেন ভারতের জন্য এক সাঁ মার্কো কনভেন্ট গঠন করেছে বলে মনে হয়।"

অজন্তা গুহা দেখে নিবেদিতা এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'অজন্তার প্রাচীন মঠ' (The Ancient Abbey of Ajanta) গ্রন্থে গুহার অনন্য চিত্রকলা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন।

''সব মিলিয়ে ছাব্বিশটি গুহা রয়েছে। একটি রেখার মতো সারিবদ্ধভাবে ঘন নীল পাহাড়ের গায়ে বৃত্তাকারে যেন ঝুলে আছে শিখর থেকে। নিশ্চিতভাবেই বহু প্রাচীন খোদাইয়ের এই কাজ যথাযথ আকৃতি আর উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে এক সৌন্দর্যময় সুষম সমন্বয় সাধন করেছে।

''... আমরা নিচের খরস্রোতা নদীর পাশে কয়েকশো ফুট দূর থেকে যখন গুহাগুলিকে প্রথম দেখি তখন মনে হয়েছিল যেন ঝুলন্ত স্তম্ভযুক্ত বারান্দা সারিবদ্ধভাবে রয়েছে।

''কত নিঃসঙ্গ নির্জনতায় এই পাহাড় ঘেরা ছোট উপত্যকাটি আমরা খুঁজে পেলাম। উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত জলের স্রোত অবিশ্রান্ত ঝরনার মতো পড়ছে এবং দূরে চলে যাচ্ছে, যেন ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়। মঠের সন্ন্যাসীরা যেমন পরিবেশ পছন্দ করেন এ যেন সেরকম এক নৈসর্গিক স্থান। প্রবাহিত স্রোতের শব্দ এবং ঝরনার পড়তে-থাকা জলের স্বরতান অবিরত মন্ত্রোচ্চারণের মতো যেন মঠের পরিবেশ রচনা করেছে। এই রুক্ষ ও অবিন্যস্ত পাহাড়-শ্রেণির প্রান্তরে এক লহমায় এমন সুন্দর একটি মঠের দেখা মিলবে তা কল্পনাও করা যায়নি।

''... এই কারুকাজের আনুপাতিক মাত্রাটি চমৎকার, প্রশস্ত, অতি উচ্চাঙ্গের, বিশাল। কিন্তু এগুলির মধ্যে একমাত্র প্রথম গুহাটিতেই সবথেকে উৎকৃষ্ট কাজের নিদর্শনটি রয়েছে।"

অজন্তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের। এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, ''নিবেদিতা অজন্তা থেকে ফিরে আসার পূর্বে আমাদের বারবার উপদেশ দিলেন জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন আমাদের Oriental Art Society-র প্রদর্শনীতে আসতেন এবং অবনমামার এবং গগনমামার সঙ্গে একযোগে আমাদের [শিল্পীদের] উৎসাহিত করতেন। একদিন ফরদাপুর ডাকবাংলোর নিকটে একটি গ্রামের ধারে হনুমানজীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এই যে মন্দিরময় ভারত—এর সঠিক পরিচয় যে পাবে সেই ভারতের ধর্ম, দর্শন এবং আর্টের গূঢ় দ্বার উন্মোচন করতে পারবে। আমার খুব ইচ্ছা, এই গ্রাম্যদেবতার মন্দিরটিকে অবলম্বন করে একটি Myths & Legends of the Hindus বই লিখব। আর তুমি আর নন্দলাল তার জন্য ছবি আঁকবে। আমাকে বললেন লিরিক্যাল বিষয় আঁকতে এবং নন্দকে ক্ল্যাসিক্যাল। আমার ছবিতে তিনি লিরিক-ধর্ম পেতেন এবং নন্দলালের ছবিতে ক্ল্যাসিক্যাল ভাব। বলতেন, গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের আমরা দুই শিষ্য দুইপ্রকার গুণে গুণান্বিত। দুর্ভাগ্যবশত ভগ্নী নিবেদিতার Myths and Legends বইখানি লেখা শেষ হবার পূর্বে অকালে দেহান্ত হলো। পরবর্তীকালে কুমারস্বামী বইখানি লিখে [অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ লিখে] প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু তাঁর [নিবেদিতার] পরিকল্পিত চিত্রকলার বিষয় কিছুই হল না। আমি পূজনীয় নিবেদিতাকে জীবিত থাকার কালে গ্রাম্য হনুমানের মন্দিরের যে-ছবিখানি এঁকে দিয়েছিলাম

সেইটি এবং ধ্রুবের তপস্যা ছবি দুখানি ছাড়া অন্য কোনো লিরিক্যাল ছবি এঁকে দিতে পারিনি। আমরা তখন কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে-কাজ করেছি তাতে ভগ্নী নিবেদিতার উৎসাহ যে-বল দিয়েছে তা লিখে বোঝানো অসাধ্য।"

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতিচারণায় : ‘‘একবার তিনি [নন্দলাল] রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, পিছনে এসে দাঁড়ালেন... নিবেদিতা।... কিন্তু কই, তাঁদের নয়নে স্বর্গীয় সুষমা তো নেই, দ্যুলোকের দিব্যজ্যোতিতে দীপ্ত হয়নি তো সুঠাম শ্যামবরতনু! নিবেদিতা শুধালেন, ‘কার ছবি আঁকছ আর্টিস্ট?’ ‘রাধাশ্যামের’—নন্দলাল বললেন। ‘তা তো নীলাভ অঙ্গলাবণ্য দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এতে যে যৌবনসুলভ আত্মোচ্ছ্বাস তোমার, আর্টিস্ট। পঞ্চাশ অতিক্রম না করে রাধাকৃষ্ণের লীলা আর এঁকোনা, বুঝলে?’ নন্দলাল সে উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন।"

নিবেদিতা ছিলেন ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত বোদ্ধা। তিনি তরুণ শিল্পীদের ছবির সমালোচনা লিখতেন, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেন, ভারতীয় ভাবধারার অনুগামী শিল্পীরা তাঁর নির্দেশে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। অজন্তার ছবি তাঁকে আত্মহারা করে দিত। অজন্তার ভিত্তিচিত্রে তিনি খাঁটি ভারতীয় শিল্পের অভিব্যক্তি লক্ষ করেছেন; এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তির মধ্যে হিন্দুধর্মের সমন্বয়ভাবনার প্রস্তর-রূপায়ণ রয়েছে, একথাও বলেছেন। অর্থাৎ নব্য ভারতীয় শিল্পের আদর্শ হিসেবে অজন্তার আঙ্গিক তথা ভারতীয় ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যগুলি মেলে ধরার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পের যে-নতুন ধারা গড়ে উঠেছে তাতে অজন্তার চিত্রকলা শিল্পীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নন্দলাল ও অসিতকুমারের কাজে অজন্তা চিত্রমালার ‘মনুমেন্টাল কোয়ালিটি’ বা বৃহত্ত্বগুণ আর অঙ্কনধর্মিতা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। অবনীন্দ্রনাথের কাজে পার্সিয়ান ও মোগল মিনিয়েচার ছবির প্রভাব বেশি থাকলেও তাঁর ছাত্র নন্দলাল গুরুর প্রায় বিপরীত পথে হেঁটে অজন্তার শৈলী ও বিন্যাসের ধারাটিকে আত্মস্থ করেছিলেন। এতেই তাঁর নিজস্ব অঙ্কনশৈলী গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নিবেদিতার ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। নিবেদিতা সর্বদা ভারতীয় শিল্পকলার নবজন্ম-গ্রহণের স্বপ্ন দেখতেন। এই ধরনের শিল্পশৈলীকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন; বলেছেন, ‘‘আমি চাই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের যোগ—নিছক চোখ ও হাত দিয়ে আঁকা ছবি নয়। চাই ভাবাত্মক ছবি।"

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নিবেদিতার এই বিরাট ভূমিকাকে স্মরণ করে ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছেন, ‘‘পাশ্চাত্য আদর্শ বর্জন করিয়া প্রাচ্য আদর্শে নূতন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।... ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিকে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার সুদীর্ঘ শৈশবকালে এই নবজাত শিশুকে যেরূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে লালনপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী মহিলার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে যদি বাঙালি জাতি করজোড়ে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তাহার ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কস্পর্শ হইবে।" ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, খণ্ড ৪, ১৪০১

২। Collected and Edited by Shankari Prasad Basu, *Letters of Sister Nivedita*, Advaita Ashrama, Kolkata, 2017